জগজ্জননী সারদা

বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

পুষ্পাঞ্জলি

ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব নিজের মুখে যাঁকে 'সারদা-সরস্বতী' বলেছেন, স্বামীজি স্বয়ং যাঁকে 'জ্যান্ত দুর্গা' বলেছেন, এবং সর্বোপরি, যিনি নিজেই নিজেকে সাক্ষাৎ 'কালী' বলে স্বীকার করেছেন, তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলা বা লেখা বড়ো কঠিন কাজ। খুবই কঠিন।

কিছু প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়, ('আনন্দবাজার পত্রিকা', 'বর্তমান', 'সাপ্তাহিক বর্তমান', 'আদ্যাপিঠ মাতৃপূজা', মাতৃবাণী ইত্যাদি)। সেগুলোকেই একত্র করে বেঁধে দিলাম দুই মলাটের মধ্যে। পুষ্পাঞ্জলি দিলাম মায়ের চরণে। এতে যদি জগতের একজনেরও কল্যাণ হয়, তাহলেই মাতৃচরণে এই পুষ্পাঞ্জলি-দান সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

শ্রীমা সারদাদেবী এক বিস্ময়কর চরিত্র! এক অবিশ্বাস্য ব্যক্তিত্ব! কখনও তিনি স্নেহময়ী জননী, কখনও বা অত্যন্ত ব্যক্তিত্বময়ী সঙ্ঘ-জননী। কখনও কুসুমের চেয়েও কোমল। কখনও বজ্রের চেয়েও কঠোর। আর কী বিস্ময়করভাবে আধুনিকা! আধুনিক-মনস্কা! স্বভাবত লজ্জাশীলা। কিন্তু অত্যন্ত তেজস্বিনী। একই অঙ্গে কত রূপ! ভাবতে অবাক লাগে।

অসংখ্য সমস্যায় ক্লিষ্ট মানুষের জন্য তাঁর স্নেহের আঁচলে বাঁধা আছে অসংখ্য সমাধানের আশীর্বাদি ফুল। যে চায়, সে তো পায়ই; যে চায় না, সেও পায়।

তিনি সৎ-এর তো মা বটেই। অসৎ-এর মা। রাজার মা। অবার ফকিরেরও মা। বিদ্বানের মা। আবার মূর্খেরও মা।

আবার, যেমন-তেমন মা নন। নিজেই বলেছেন, আমি পাতানো মা নই। সত্যিকারের মা।

সেই সুগর্ভধারিণী, জগন্মাতা শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর চরণে শ্রদ্ধা-বিশ্বাস-ভক্তির ফুল-বেলপাতা-চন্দনের পুষ্পাঞ্জলি দিলাম। গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা।

মায়ের চরণে প্রার্থনা, 'মা! সবার মঙ্গল করো! সকলকে শুভবুদ্ধি দাও! মানুষ করো! সকলকে তোমার শ্রীচরণে ভক্তি-বিশ্বাস-নির্ভরতা দাও! সকলকে কৃপা করো! খুব কৃপা করো মা!'

বইমেলা, ২০০১ — **বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী**

'শ্রীরামকৃষ্ণ কুটির'

উত্তরপাড়া-৭১২২৫৮

কৃতজ্ঞ, খুব কৃতজ্ঞ

এ বইয়ের সমস্ত রচনাই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত। অথবা, প্রকাশের অপেক্ষায়। বেশির ভাগ লেখাই বর্তমান, সাপ্তাহিক বর্তমান, আনন্দবাজার পত্রিকা, আদ্যাপীঠ মাতৃপূজা, মাতৃবাণী ইত্যাদি
পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

যাঁরা এই সব প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন, যাঁরা এই বই প্রকাশ করছেন— তাঁদের সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। খুব কৃতজ্ঞ।

বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী
বইমেলা, ২০০১
উত্তরপাড়া

মা সারদা দেবী : বিস্ময়করভাবে আধুনিকা

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহাবসান হয়েছে। তাঁর ভাগবতী তনু কাশীপুর মহাশ্মশানে পবিত্র চিতাগ্নিতে অর্পণ করে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে কাশীপুর উদ্যানবাটিতে ফিরে এসেছেন তাঁর ত্যাগী সন্তানরা। সন্ধ্যা সমাগত।

মা সারদাদেবী হৃদয়-বিদারক শোককে সংহত করে, সমাজের নিষ্ঠুর বিধানকে মান্য করতে, গা থেকে একে একে সব অলঙ্কার খুলে ফেলছেন। শুধু শ্রীরামকৃষ্ণের গড়িয়ে দেওয়া সোনার বালাটা বাকি।

সেই বালাও যখন খুলতে যাচ্ছেন, গলার অসুখের আগের রূপ ধরে তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন শ্রীরামকৃষ্ণ। মার হাত চেপে ধরলেন। বললেন, 'আমি কি মরেছি, যে তুমি এয়োস্ত্রীর জিনিস হাত থেকে খুলে ফেলছ?'

বালা আর খোলা হল না। অন্যান্য ব্যাপারে অতঃপর কী সিদ্ধান্ত নিতে হবে, তা তৎক্ষণাৎ স্থির করে ফেললেন। নিজের হাতে কিছু শাড়ির পাড় ছিঁড়ে সরু করে ফেললেন। এবং সেই থেকে আজীবন সরু লালপাড় কাপড়ই পরেছেন। অন্য কাপড় নয়।

নিজের সঙ্গে, নিজের বিশ্বাসের সঙ্গে তথাকথিত বহু বহিরঙ্গে-আধুনিকার মতো কোনোরকম প্রতারণা করেননি।

তাঁর গতির্ভর্তাসখাহরি স্বামীর কাছ থেকে সদ্য-পাওয়া নির্দেশকে মান্য করতে, সমাজপতিদের তর্জনীর শাসনকে গ্রাহ্য করেননি।

লোকাচারের কাঁচি তাঁর শাড়ির পাড়কে কেটে সরু করে দিয়েছে। সত্য। কিন্তু, এক আপাত-দৃষ্টিতে-সামান্যা নারীর তেজোময় ব্যক্তিত্বের দাপটে সে কাঁচিকে লেজ গুটিয়ে পালাতে হয়েছে। চির সধবা মায়ের শাড়িতে বৈধব্যের চিহ্ন এঁকে দেওয়ার সাহস তার হয়নি।

ভাবতে অবাক লাগে, এক নিষ্ঠাবান হিন্দু পরিবারের মেয়ে, অপর এক ডাকসাইটে নৈষ্ঠিক হিন্দু পরিবারের কুলবধূ, এবং সর্বোপরি, এক দেশখ্যাত অবতারের সহধর্মিনী হয়ে এই দুঃসাহসী সিদ্ধান্ত তিনি কীভাবে নিয়েছিলেন!

আজ থেকে একশো বছর আগেকার রক্ষণশীল সমাজের প্রেক্ষাপটে এই সিদ্ধান্ত যে তথাকথিত সমাজের অভিভাবকদের মুখের ওপর এক চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিল, তা কি আমরা অস্বীকার করতে পারি?

শ্রীরামকৃষ্ণ জানতেন, সারদাকে একদিন শত-সহস্র সন্তানের মা হতে হবে। সঙ্ঘজননী হতে হবে। আর তাই, তাঁর গুণবতী সহধর্মিনীকে তিনি তিলে তিলে গড়ে তুলেছিলেন।

'অন্ধকারে পোকার মতো কিলবিল করা কলকাতার লোকগুলো'-কে দেখার দায় চাপিয়ে দিয়েছিলেন সেই যোগ্যতমার স্কন্ধে। বলেছিলেন, 'এ (শ্রীরামকৃষ্ণ) আর কী করেছে? তোমাকে এর অনেক বেশি করতে হবে।' 'শুধু কি আমারই দায়? তোমারও দায়।'

শ্রীরামকৃষ্ণের অর্পিত দায়িত্ব অত্যন্ত শ্রদ্ধা এবং সাফল্যের সঙ্গে পালন করেছিলেন মা। আর এই সাফল্যের পেছনে ছিল তাঁর অপার মাতৃস্নেহ, গভীর প্রজ্ঞা, অলঙ্ঘ্য ব্যক্তিত্ব, তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার অসাধারণ ক্ষমতা নিজের সিদ্ধান্তে অবিচল থাকার মানসিক দৃঢ়তা, যে কোনো সমস্যাকে মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা, নির্মোহ এবং সর্বকুসংস্কারমুক্ত স্বচ্ছ আধুনিক চিন্তাধারা এবং সর্বোপরি শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে পূর্ণ নির্ভরতা।

একটি লাল সরু-পেড়ে শাড়ির এত শক্তি! এতগুলি বিশেষ ক্ষমতাকে সে অবগুণ্ঠনবতী করে রেখেছিল! দিনের পর দিন! এমন কি শ্রীরামকৃষ্ণের বাঘা বাঘা ত্যাগী সন্তানরাও প্রথমে তাঁকে চিনতে পারেননি। ধন্য সেই সংযম! ধন্য সেই মৌন অন্তর্মুখীনতা! সেই ঢক্কানিনাদ বিমুখতা!

অনেক বহিরঙ্গে আধুনিকাকে দেখেছি। আপদমস্তক কুসংস্কারে মোড়া। শুচিবাইগ্রস্তা। ছুঁৎমার্গী। কাকবিষ্ঠা মাথায় পড়লে সোনা-রুপোর জলে স্নান করেন। কুকুরের বিষ্ঠা মাড়ালেও তাই।

নষ্ট-চরিত্রা মহিলাকে বুকে টেনে নিয়ে তাঁকে সামাজিক মর্যাদা দেওয়ার কথা তো কল্পনাই করতে পারেন না তাঁরা।

অথচ মা?

তিনি এসব শুচিবাই আর ছুঁৎমার্গের অনেক ঊর্ধ্বে ছিলেন। আজকে নয়। সেই একশো বছর আগেই।

তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী নলিনীর গায়ে কাকের প্রস্রাব পড়েছে। অশুচি বোধ করায় স্নান করেছেন নলিনী। মা বললেন, 'শুচিবাই! মন আর কিছুতেই শুদ্ধ হচ্ছে না!....শুচিবাই যত বাড়াবে তত বাড়বে।'

অন্য এক সময়, এই নলিনীকেই বলছেন, 'আমিও তো দেশে কত শুকনো বিষ্ঠা মাড়িয়ে চলেছি। দু-বার 'গোবিন্দ, গোবিন্দ'' বললুম, ব্যস্ শুদ্ধ হয়ে গেল। মনেতেই সব। মনেই শুদ্ধ। মনেই অশুদ্ধ।'

জয়রামবাটীর রাঁধুনী ব্রাহ্মণী বেশি রাতে কুকুর ছুঁয়ে ফেলায় স্নান করতে চাইলে, মা নিষেধ করলেন। হাত-পা ধুয়ে গঙ্গাজল নেওয়ার উপদেশ দিলেন। রাঁধুনীর মনে তবুও খুঁত খুঁত। মা বললেন, 'তবে আমাকে স্পর্শ করো'।

কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রাম্য মহিলার মনকে ধাক্কা মেরে জাগাবার মোক্ষম দাওয়াই। কী শক্তিশালী!

এক ভক্তের মাতৃবিয়োগ হয়েছে! মায়ের দেওয়া পুলিপিঠে খেতে ইতস্তত করছেন। মা তাঁকে অভয় দিলেন, 'তাতে দোষ কী বাবা? আমি ও তো মা! আমি দিচ্ছি—এখানে কোনো দোষ নেই।'

'অশুচি অবস্থায় ঠাকুরকে পুজো করা চলে কি?' এক মহিলার প্রশ্ন।

উত্তরে মা বললেন, 'হ্যাঁ মা, চলে। যদি ঠাকুরের উপর তেমন টান থাকে। তুমি পুজো করো। কিন্তু মনে কোনো দ্বিধা এলে কোরো না।'

স্পষ্ট উপদেশ। আধার-অনুসারী।

সমাজের যে পরিকাঠামোর মধ্যে বাস করতে হবে, তাকে সংস্কারের দোহাই দিয়ে এক আঘাতে ধূলিসাৎ করতে চাননি মা। সেই কাঠামোর মধ্যে থেকেই—অতি সন্তর্পণে তার ঘুণ-ধরা কড়ি-বরগাগুলোকে পাল্টে দিতে প্রয়াসী হয়েছেন। ঠিক যেমনটি করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দ।

বিদেশিনী ভক্তদের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার ছিল আশ্চর্যরকমভাবে নিঃসঙ্কোচ। তাঁদের সঙ্গে করমর্দন করতেন একেবারে ইউরোপীয় কায়দায়। তাঁদের সঙ্গে এক পংক্তিতে খেয়েছিলেন শুনে বিস্মিত হয়েছিলেন স্বামীজি।

ওলি বুলদের প্রার্থনায় সাহেব ফোটোগ্রাফারের ক্যামেরার সামনে বসে ছবি তুলেছেন।

শাসক ইংরেজের অপশাসনের অবসান কামনা করেছেন নিত্যদিন। কিন্তু ইংরেজমাত্রকেই ঘৃণা করেননি। বলতেন, 'তারাও তো আমারই সন্তান!'

সঙ্ঘজননী হিসেবে প্রয়োজনে মাতৃস্নেহকে আড়াল করে, সামনে তুলে ধরেছেন দৃঢ় ব্যক্তিত্বের ভাবমূর্তি। তাঁর কঠোর নির্দেশে চুরির অপরাধে মঠ থেকে বিতাড়িত ভৃত্যকে আবার ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছেন স্বামীজি।

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহাবসানের পর, তাঁর চিতাভস্ম নিয়ে তাঁর ত্যাগী এবং গৃহীভক্তদের মধ্যে বিবাদ চরমে উঠলে, তিনি অত্যন্ত মার্জিত অথচ শানিত ভাষায় তার ভর্ৎসনা করে গোলাপ মাকে বলেছেন, 'এমন সোনার মানুষই চলে গেলেন! দেখেছো গোলাপ! ছাই নিয়ে ঝগড়া করছে!'

অহং-সর্বস্ব অন্তঃসারশূন্য ভোগবাদী পাশ্চাত্য আধুনিকতা যাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি, সেই অপাপবিদ্ধা, পবিত্রতাস্বরূপিণী, প্রকৃত আধুনিকা, মা ভগবতী শ্রীশ্রীসারদাদেবীর চরণে শত কোটি প্রণাম।

প্রার্থনা জানাই, তিনি আমাদের সকলকে শুভবুদ্ধি আর তাঁর মতো নির্মোহ স্বচ্ছ আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি দিন।